নকল-ভেজালে বাজার সয়লাব

বছরে ২০০০ কোটি টাকার ওষুধ আসে চোরাই পথে

†`‡k ˆZwi n‡"Q AvšRwZK gv‡bi Ila| evo‡Q ißvwb| meB ô82 mv‡ji Ila bxwZi mdj| †mB Ila bxwZ wb‡q Pj‡Q lohš| †`‡k †gvU Il‡ai evRvi cvq 7 nvRvi †KwU UvKvi| fviZ †_‡K †fRvj Ges bKj Ila wb‡q Avm‡Q †PvivKviewiiv, Zv‡`i `L‡j GLb 2 nvRvi †KwU UvKvi evRvi ...

বদরুল আলম নাবিল

মিটফোর্ড ওষুধ মার্কেটে একটি দোকান ছিল মধ্যবয়সী আবুল হোসেনের। তার ব্যবসার বৈশিষ্ট্য ছিল সে ভেজাল এবং নকল ওষুধ বিক্রি করতো। বছর দুয়েক আগে তার স্ত্রী জন্ডিসে আক্রান্ত হয়। অবস্থার অবনতি হতে থাকলে মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করায়। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দেয় আর আবুল হোসেন নিজের দোকানের ওষুধ এনে তাকে খাওয়ায়। এভাবে অবস্থার অবনতি হতে হতে তার স্ত্রী মারা যায়।

এরপর আবুল হোসেন কান্নাকাটি করে ওষুধের ব্যবসা গুটিয়ে চলে যায়। সে বলে, যে ভেজাল-নকল ওষুধ খেয়ে আমার স্ত্রী মারা গেল সে ব্যবসা আমি করবো না।

একজন আবুল হোসেন ভেজাল-নকল ওষুধের ব্যবসা ছেড়ে চলে গেছে, তার বিপরীতে প্রতি বছর আরো শত শত আবুল হোসেন জড়িয়ে পড়ছেন এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে। মাঝেমধ্যেই মিটফোর্ডের ওষুধের মার্কেটে যেতে হয়। প্রতিবারই মনে হয় আগেরবার এসে দোকানগুলোতে যে পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় ওষুধ দেখেছি, পরেরবার তারচেয়ে বেশি দেখছি। মিটফোর্ড এলাকায় ছোট-বড় ২৫টি হোলসেল ওষুধ মার্কেট আছে। এই মার্কেটগুলোতে দুই সহস্রাধিক পাইকারি ওষুধের দোকান আছে। বছর পাঁচেক আগে থেকেই প্রায় সবগুলো দোকানেই ভারত এবং পাকিস্তান থেকে আসা চোরাই ওষুধ বিক্রি হতো। তবে তখন নির্দিষ্ট কিছু দোকান ছাড়া অন্যরা রাখঢাক করে অনেকটা গোপনে এসব অবৈধ ওষুধ বিক্রি করতো। বেশির ভাগ দোকানের ডিসপ্লেতে ছিল দেশী কোম্পানিগুলোর ওষুধ। এখন প্রায় সবগুলো দোকানের তাক ভর্তি সাজানো চোরাই পথে আসা ওষুধ দিয়ে। আগে খুঁজতে হতো কোন দোকানে ভারতীয় ওষুধ পাওয়া যায়, আর এখন কোন দোকানে পাওয়া যায় না তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। প্রায় ৩০ শতাংশ দোকানে শুধু এসব অবৈধ ওষুধই বিক্রি হয়। দেশী ওষুধ তারা বিক্রি করে না। শুধু মিটফোর্ডের মার্কেটগুলোই নয়, দেশের অন্যান্য হোলসেল মার্কেটগুলোতে একইভাবে প্রকাশ্যে বেচাকেনা হচ্ছে চোরাচালানির মাধ্যমে আসা অবৈধ ওষুধ।

দোকানের তাক ভর্তি সাজানো চোরাই পথে আসা ওষুধ দিয়ে। আগে খুঁজতে হতো কোন দোকানে ভারতীয় ওষুধ পাওয়া যায়, আর এখন কোন দোকানে পাওয়া যায় না তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল

বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি এসএম শফিউজ্জামান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'গত বছর আমরা সবগুলো কোম্পানি মিলে দেশে মোট ওষুধ বিক্রি করেছি ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকার। একই সময়ে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার চোরাই ওষুধ বিক্রি হয়েছে এখানে।' ওষুধ দোকান মালিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতি'র নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন নেতা ২০০০কে বলেছেন, 'সংখ্যাটা এতো বড় হবে না। তবে বছরে অন্তত হাজার কোটি টাকার অবৈধ ওষুধ দেশে আসে চোরাই পথে।'

সর্বনিম্ন অঙ্ক এক হাজার কোটি টাকাও যদি ধরে নেই তবে সেটা কম নয়। এর সঙ্গে আছে দেশী নকল ও ভেজাল ওষুধ। তাও এক হাজার কোটি টাকার কম হবে না। সব মিলিয়ে কম করে হলেও ২ হাজার কোটি টাকার চোরাই এবং নকল-ভেজাল ওষুধ বিক্রি হ‡"Q এখানে। এসব নিম্নমানের ওষুধ আমরাই কিনছি এবং তা খেয়ে রোগ ভালো হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশি মাত্রায় আক্রাš হ"Q।

ওষুধ শিল্প সমিতি দাবি করছে, দেশের মোট চাহিদার ৯৭ ভাগ ওষুধ যোগান দেয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছি আমরা। দেশের ৯৭ ভাগ চাহিদা মেটানোর পরও প্রায় ২৫০ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি করছি। রপ্তানি হচ্ছে ৬০টি দেশে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে ওষুধ

রপ্তানি ৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে তারা স্বপ্ন দেখছেন, (কারণ LDC ভুক্ত দেশ হওয়ায় ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্যাটেন্ট ড্রাগ তৈরি করতে পারবে বাংলাদেশ)।

ওষুধ শিল্প সরকারকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানকারী খাত। বাংলাদেশের ওষুধ বিশ্ববাজারে বেশ সুনামের সঙ্গে ক্রমশ তার জায়গা পোক্ত করে চলছে। এতোসব অর্জন এসেছে মাত্র গত দু' দশকে।

ওষুধ তৈরির খরচ কমেছে অন্তত ৬০ শতাংশ। সে কারণে বাংলাদেশে সব ধরনের ওষুধের দাম অন্তত অর্ধেক কমানো সম্ভব।'

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছেন, 'আমার কোম্পানি গণস্বাস্থ্যের ওষুধের দাম আমরা কমাতে পারি না। কারণ একই গ্রুপের ওষুধের দাম যদি কম-বেশি থাকে তবে মানুষ মনে করে যেটির দাম কম সেটির মান খারাপ।'

বহুল ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক

'গত কয়েক বছরে বিশ্ববাজারে ওষুধ তৈরির কাঁচামালের দাম কমেছে ৬৫ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত। সে কারণে বাংলাদেশে সব ধরনের ওষুধের দাম অন্তত অর্ধেক কমানো সম্ভব'

এতো সাফল্যের পরেও দেশের বাজারের প্রায় অর্ধেকটা কেন অবৈধ চোরাই ওষুধের দখলে?

ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি এসএম শফিউজ্জামান ও অন্যান্য মালিকদের অভিমত, বর্ডার সিকিউরিটি ভালো নয় বলে এ দেশ ভারতীয় ওষুধে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে ওষুধ দোকান মালিকদের সংগঠন 'কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট এসোসিয়েশনের' মতে, দেশী ওষুধ কোম্পানিগুলো অস্বাভাবিক রকম বেশি দাম রাখে বলে ওষুধ ভেজাল, নকল হচ্ছে এবং চোরাই পথে ওষুধ আসছে। তাদের অভিমতের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন ১৯৮২ সালের ওষুধনীতির প্রণেতা প্রফেসর ডা. নূরুল ইসলাম এবং ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তারা বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে বিশ্ববাজারে ওষুধ তৈরির কাঁচামালের দাম কমেছে ৬৫ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত। তাই

সিপ্রোফ্লক্সাসিন কোম্পানিভেদে বিক্রি হয় ৮ থেকে ১৪ টাকা। ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি এসএম শফিউজ্জামানের কোম্পানি হাডসন এটি বিক্রি করছে ৫০০ এমজি ৮ টাকা, অন্যদিকে একই সংগঠনের মহাসচিব নাজমুল হাসানের কোম্পানি বেক্সিমকো বিক্রি করে ১৪ টাকা।

দেশের আরেকটি কোম্পানি বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ওষুধ ২৫০ এমজি আড়াই টাকা এবং ৫০০ এমজি ৫ টাকায় সরবরাহ করছে। জীবন রক্ষাকারী আরেকটি এন্টিবায়োটিক সেফট্রিয়েক্সন বেক্সিমকো, স্কয়ার, একমির মতো কোম্পানিগুলো বিক্রি করে ২৮০-৫০০ টাকা, অন্যদিকে গণস্বাস্থ্য ও ইনসেপ্টা বিক্রি করে ২০০ টাকা।

এ রকম আরো শতাধিক ওষুধের নাম বলা যাবে। কোম্পানিভেদে যার দামের পার্থক্য ১০০ শতাংশের বেশি।

ওষুধের মূল্য নির্ধারণের জন্যে বাংলাদেশে একটি স্বীকৃত ফর্মুলা আছে, যেটাতে কাঁচামালে ও প্যাকেজ সামগ্রীর মূল্যের সঙ্গে ফর্মুলেশনভেদে ২২০ থেকে ৩৪০ শতাংশ যোগ করে খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু আমাদের কোম্পানিগুলো ন্যায্যমূল্যের চেয়ে আরো ১০০, ২০০ বা ৩০০ শতাংশ বেশি মূল্য নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মতে, 'এই অস্বাভাবিক মুনাফার কারণে একশ্রেণীর অসাধু লোক দ্রুত টাকা কামানোর জন্য নকল-ভেজাল ওষুধ তৈরি করে।'

তিনি বলেছেন, ওষুধের দাম না কমালে ভেজাল নকল এবং চোরাচালান কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশে ওষুধ শিল্পের এই জয়জয়কার বিকাশের কারিগর ১৯৮২ সালের ওষুধনীতি। ঐ নীতির ফলে বহুজাতিক কোম্পানির ছোবল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলো বিশাল লাভ করতে থাকে।

ঐ ওষুধ নীতির একটি মূলশক্তি ছিল সরকার কর্তৃক ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু ১৯৯৪ সালে পূববর্তী বিএনপি সরকার এক নির্বাহী আদেশ জারি করে ১১৭টি ওষুধ ছাড়া বাকি ওষুধগুলোর ওপর থেকে মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেয়।

যে ১১৭টি ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সরকারের হাতে আছে, যেগুলোর মধ্যে ১৫-১৬টি ছাড়া বাকি ওষুধগুলো এখন আর কোম্পানিগুলো তৈরি করছে না। ফলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ এখন মোট বাজারের শতকরা দশ ভাগ ওষুধের ওপর কার্যকর, বাকি ৯০ ভাগ ওষুধের মূল্যের ওপর

'আমার মনে হয়, বছরে দেশে চোরাই ওষুধ আসে ৫ হাজার কোটি টাকার'

এসএম শফিউজ্জামান
সভাপতি, বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের ওষুধের মান বেশ ভালো, তারপরও অবৈধভাবে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ওষুধ বাংলাদেশে আসে, কারণ কী?

শফিউজ্জামান : এর প্রধান কারণ আমাদের দেশ থেকে প্রচুর রোগী ভারতে যায় চিকিৎসার জন্য। ভারতের ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশনে তাদের দেশের কোম্পানিগুলোর ওষুধের নামই লিখে থাকেন। রোগীরাও ঐসব ওষুধই কিনতে চান। যদিও একই গ্রুপের ভালো মানের, ক্ষেত্রবিশেষে ভারতীয় ওষুধের চেয়েও ভালো মানের ওষুধ এখানকার কোম্পানিগুলো উৎপাদন করছে। তারপরও রোগীরা ভারতীয় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধটিই কিনবেন। এভাবেই ভারতীয় ওষুধের একটা বড় মার্কেট তৈরি হয়েছে এখানে।

আর যেসব ওষুধ আমাদের এখানে পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় সেগুলো আমদানি করা নিষিদ্ধ। তাই এগুলো অবৈধভাবে আসে। দেশের মোট চাহিদার ৯৭ শতাংশ মেটানোর সক্ষমতা অর্জন করেছে আমাদের ওষুধ শিল্প। আমাদের রপ্তানি বাজারও ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু অবৈধভাবে দেশে প্রচুর পরিমাণে ওষুধ প্রবেশ করছে, এটাই আমাদের প্রধান সমস্যা। এছাড়া এখানেও অসাধু ব্যবসায়ীরা নকল ওষুধ তৈরি করছে।

২০০০ : চোরাই পথে কী পরিমাণ ওষুধ এখানে আসছে?

শফিউজ্জামান : এটা বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমরা সবগুলো কোম্পানি মিলে গত বছর দেশে ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি করেছি। আমার ধারণা, এ বছর অবৈধভাবে দেশে আমদানি হয়েছে ৫ হাজার কোটি টাকার ওষুধ।

২০০০ : এটা তো বিরাট অঙ্ক। এতো অবৈধ ওষুধ কীভাবে আসে?

শফিউজ্জামান : বাংলাদেশের ৯৯ ভাগই ভারতের বর্ডার। এই বর্ডারগুলো দিয়ে অনেকে মাথায় করে এপারে নিয়ে আসে ওষুধ। ভারতের বর্ডার এলাকায় অসংখ্য নকল এবং নিম্নমানের ওষুধ তৈরির কারখানা হয়েছে। এরা আমাদের নামী কোম্পানিগুলোর চালু ওষুধগুলো তৈরি করে এখানে বাজারজাত করে। আমরা কয়েক বছর

সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কেননা সেসব ওষুধে সুনাফার সুযোগ কম।

এ সকল ওষুধের মূল্য নির্ধারণের জন্য স্বাস্থ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি আছে। এই নামকাওয়াস্তে কমিটিতে প্রধানত কোম্পানিগুলো তাদের ইচ্ছায়ই মূল্য নির্ধারণ করে। কিন্তু তাও আবার মানা হয় না। তা না হলে একই ওষুধের দাম একেক †Kv¤úvwb একেক রকম নিতে পারতো না।

সম্প্রতি ওষুধনীতি ২০০5 মন্ত্রিসভায় পাস হয়েছে। এটি সংসদের অনুমোদন লাভ করলে এই অরাজকতা আরো বাড়বে।

ওষুধ কোনো সাধারণ পণ্য নয়। ওষুধ পৃথিবীর একমাত্র পণ্য, যেখানে ক্রেতার কোনো পছন্দ নেই। এ ক্ষেত্রে ওষুধ পছন্দ করবে ডাক্তার, মূল্য নির্ধারণ করবে কোম্পানি এবং মূল্য পরিশোধ করবে রোগী। অন্য পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন কোক ১০ টাকায় না কিনে ক্রেতা প্রাণকোলা ৭ টাকায় কিনতে পারে। কিন্তু ওষুধে তা নয়।

চিকিৎসক প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম লেখার সময় সাধারণত মূল্য বিবেচনায় আনে না। বরং যে কোম্পানির কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকেন তাদের ওষুধের নামই লিখে থাকেন। এভাবে ওষুধ কোম্পানি এবং চিকিৎসকদের বিশেষ সমঝোতার কাছে অসহায় সাধারণ রোগীরা। ৩-৪ গুণ বেশি মূল্য দিয়ে কিনতে হয় তাকে ওষুধ।

এ কারণে বিশ্বব্যাপী ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকে সরকারের কাছে। অন্যথায় কোম্পানিগুলো ডাক্তারদের পার্সেন্টেজের মাধ্যমে প্রভাবিত করে প্রেসক্রিপশনে তাদের ওষুধের নাম লিখিয়ে থাকে, যা এখন চলছে বাংলাদেশে। ক্রেতা বা রোগীকে পরোয়া করার প্রয়োজন নেই কোম্পানিগুলোর। চিকিৎসকদের হাতে রাখতে পারলেই ফুলে-ফেঁপে বড় হয় তাদের ব্যবসা।

ওষুধ চোরাচালান হওয়ার আরো একটি বড় কারণ এ দেশ থেকে প্রচুর রোগী চিকিৎসার জন্য যায় ভারতে। এসব রোগীর ব্যবস্থাপত্রে ভারতীয় ডাক্তাররা তাদের দেশের ওষুধের নামই লেখেন। ফলে রোগীরা সে ওষুধগুলোই কিনে থাকেন। এভাবে ভারতীয় ওষুধের একটা বড় মার্কেট তৈরি হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। ওষুধ শিল্প সমিতি এটাকে চোরাচালানের প্রধান কারণ মনে করেন। তবে দোকান মালিকরা এটাকে দ্বিতীয় প্রধান কারণ মনে করেন। তারা যুক্তি দেন, পাকিস্তান থেকেও চোরাই পথে প্রচুর ওষুধ আসছে। পাকিস্তানে চিকিৎসার জন্য কেউ যায় না। তাদের মতে, এখানে ওষুধের দাম বেশি বলে অধিক মুনাফার আশায় দোকানিরা চোরাই ওষুধ বিক্রি করে। দেখা গেছে, যে স্বল্পসংখ্যক ওষুধের মূল্য সরকার নির্ধারণ করে সেগুলো তেমন নকল হয় না। কারণ এতে মুনাফা কম। ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছে কিছু নকল ও ভেজাল ওষুধ তৈরির কারখানা। এগুলো তৈরিই হয়েছে বাংলাদেশে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য।

ওষুধ কোনো সাধারণ পণ্য নয়। ওষুধ পৃথিবীর একমাত্র পণ্য, যেখানে ক্রেতার কোনো পছন্দ নেই। এ ক্ষেত্রে ওষুধ পছন্দ করবে ডাক্তার, মূল্য নির্ধারণ করবে কোম্পানি এবং মূল্য পরিশোধ করবে রোগী। কিন্তু ওষুধে তা নয়।

পর্যবেক্ষণে মনে হয় ওষুধের এই চোরাচালান এবং নকল ভেজাল বন্ধ করা খুব একটা কঠিন নয়। পাইকারি মার্কেটগুলোতে পুলিশ এবং র‍্যাবের সমন্বয়ে সপ্তাহে বা মাসে একটি করে রেইড দিলে এটা বহুলাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। ওষুধ শিল্প সমিতিও এরকম মনে করে। তবে এটা সাময়িক সমাধান। স্থায়ী সমাধান পেতে হলে মূল্য কমিয়ে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে ওষুধ শিল্পে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ২০০২ সালের ১৪ জানুয়ারি ওষুধ শিল্প সমিতি আয়োজিত এক সেমিনারে এ বিষয়ে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু হোটেল সোনারগাঁওয়ের বলরুমেই হারিয়ে গেছে যৌথ অভিযান চালানোর সেই ঘোষণা। এসব আগে পরে আরো বহুবার তিনি এরকম ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু তা কার্যকর করার উদ্যোগটি পর্যS নেননি।

জীবন রক্ষাকারি ওষুধ নিয়ে এভাবে কত প্রতিk"তি আমরা আর শুনবো। মS¿ী মহোদয় চোরাকারবারি আর নকলবাজদের দৌরাত্মে আমাদের জীবন আর স্বাস্থ্য আজ বিপন্ন।

গুঁড়ো রয়েছে। এসব ওষুধ খুব কম দামে ওরা সরবরাহ করে, যা বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা মুনাফা বেশি পায়।

২০০০ : এসব বন্ধ করার উপায় কী?

শফিউজ্জামান : প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আমরা লিখিতভাবে আমাদের সুপারিশ জানিয়েছি। কিন্তু আমাদের দাবি অনুযায়ী কাজ হয়নি। মিটফোর্ডসহ দেশের হোলসেল মার্কেটগুলোতে পুলিশ এবং র‍্যাব দিয়ে সপ্তাহে একবার করে রেড দিলে সহজেই তা বন্ধ করা সম্ভব।

তাছাড়া দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে মাত্র ২৫টি জেলায় ড্রাগ সুপার আছে। প্রত্যেক জেলায় ড্রাগ সুপার নিয়োগ করা জরুরি।

২০০০ : ওষুধের দোকানদার এবং ১৯৮২ সালের ওষুধনীতি প্রণেতাগণ বলছেন আপনারা অস্বাভাবিক রকম দাম বেশি নিচ্ছেন বলেই চোরাচালান এবং নকল ভেজালের প্রবণতা এত বেশি?

শফিউজ্জামান : কথাটি ঠিক নয়। আমরা তো মাঝে মধ্যেই ওষুধের দাম কমাচ্ছি।

২০০০ : বিশ্ববাজারে ওষুধের কাঁচামালের দাম কমেছে ব্যাপক হারে। সে অনুযায়ী নাকি ওষুধের মূল্য অর্ধেক কমা উচিত?

শফিউজ্জামান : যেটার কাঁচামালের দাম কমছে তার দাম তো কমছে।

২০০০ : কোম্পানিগুলোর গ্রোথরেট দেখলেও তো মনে হয় আপনারা অস্বাভাবিক মুনাফা করছেন?

শফিউজ্জামান : সব কোম্পানির গ্রোথ কিন্তু সেভাবে হচ্ছে না, কেউ কেউ হারিয়েও যাচ্ছেন।

২০০০ : এ শিল্পের উন্নয়নে এই মুহূর্তে আপনাদের দাবি কি?

শফিউজ্জামান : চোরাচালান ও নকল- ভেজাল যে কোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে। এছাড়া ওষুধ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইন, নিয়মনীতি প্রতিপালন করতে হয় এবং রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন পদের জন্য পৃথক পৃথক Analysis/Test Report দাখিল করতে হয়। দেশে মানসম্মত ওষুধ প্রস্তুত এবং বিদেশে ওষুধ রপ্তানির বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের জন্য একটি অত্যাধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন একান্তই অপরিহার্য। দেশে ওষুধ শিল্প সেক্টরের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং জাপান সরকারের আর্থিক সহযোগিতাকারী প্রতিষ্ঠান জাইকা-এর পক্ষ থেকে সমিতিকে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজন ঢাকা শহরে এক বিঘা জমি যা আমরা সরকারি মূল্যে ক্রয় করতে ইচ্ছুক।

বিগত দোহা ঘোষণা অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৬ সাল পর্যন্ত Patent Drugs তৈরি করতে পারবে। সে জন্য Patent ওষুধের কাঁচামাল তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও API শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জায়গার বরাদ্দ অদ্যাবধি কার্যকর হয়নি।